সমকাল

তারিখ 17 SEP 2017 পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

শুধু ধনিক শ্রেণির জন্য উচ্চশিক্ষা নয়

শিক্ষা দিবস

ড. এম এ মাননান

উপাচার্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

আজ থেকে সাড়ে পাঁচ দশক আগে ১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ তাদের নিজস্ব দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য রাস্তায় নামে। পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরাচারী আইয়ুব খান ওই আন্দোলনকে দমন-পীড়নের মাধ্যমে স্তব্ধ করতে উদ্যত হন। চলে পুলিশের গুলি, টিয়ার গ্যাস, লাঠিচার্জ। রক্তে রঞ্জিত হয় ঢাকার রাজপথ। শহীদ হন বাবুল, গোলাম মোস্তফা ও ওয়াজিউল্লাহ। ছাত্রসমাজ ১৭ সেপ্টেম্বর তারিখটিকে 'শিক্ষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় আসে '৬৪-এর ছাত্র আন্দোলন, '৬৬-এর ৬ দফা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ। শিক্ষা দিবসের শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। স্বাধীন স্বদেশে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার ৩০ লাখ শহীদের স্বপ্নসাধ পূরণে শিক্ষাকে সহজলভ্য ও সার্বজনীন করার জন্য গণমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। ড. কুদরাত-এ-খুদার শিক্ষানীতি নামে তা ব্যাপক গণসমর্থন লাভ করে। দ্রুতই শুরু হয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী নবজাত বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সাজিয়ে তোলার কর্মযজ্ঞ। স্বাধীনতার সাড়ে পাঁচ দশক পর আমরা '৬২-র আন্দোলনের স্বাদ পাচ্ছি। কিন্তু এর পেছনের ইতিহাসটা বিভীষিকাময়, নানা চড়াই-উতরাই আর কণ্টকময়।

লৌহমানব হিসেবে কুখ্যাত স্বৈরশাসক আইয়ুব খান ক্ষমতা দখলের মাত্র ২ মাস পর ১৯৫৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন ১৯৫৯ সালের আগস্ট মাসের মধ্যে একটি শিক্ষা রিপোর্ট প্রণয়ন করে। ২৭ অধ্যায়ে বিভক্ত এই রিপোর্টে প্রাথমিক থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত সাধারণ, পেশামূলক শিক্ষা, শিক্ষক, শিক্ষার মাধ্যম, পাঠ্যপুস্তক, হরফ সমস্যা, প্রশাসন, অর্থ বরাদ্দ, শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যবিষয়ক বিস্তারিত সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়। এতে আইয়ুব শাহীর ধর্মান্ধ, পুঁজিবাদী, রক্ষণশীল, সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষা সংকোচন নীতির পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছিল। আইয়ুব সরকার এই রিপোর্টের সুপারিশ গ্রহণ করে তা ১৯৬২ সাল থেকে বাস্তবায়ন করতে শুরু করে। শরীফ কমিশনের শিক্ষা সংকোচন নীতি-কাঠামোতে শিক্ষাকে তিন স্তরে ভাগ করা হয়– প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর। পাঁচ বছরের প্রাথমিক ও তিন বছরের উচ্চতর ডিগ্রি কোর্স এবং দুই বছরের স্নাতকোত্তর কোর্সের ব্যবস্থা থাকবে বলে প্রস্তাব করা হয়। উচ্চশিক্ষা ধনিক শ্রেণির জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এ জন্য পাস নম্বর ধরা হয় শতকরা ৫০, দ্বিতীয় বিভাগ শতকরা ৬০ এবং প্রথম বিভাগ শতকরা ৭০। এই কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে পূর্ণ সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজে রাজনীতি নিষিদ্ধ করা, ছাত্র-শিক্ষকদের কার্যকলাপের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখার প্রস্তাব করে। শিক্ষকদের কঠোর পরিশ্রম করানোর জন্য ১৫ ঘণ্টা কাজের বিধান রাখা হয়েছিল।

ছাত্র ইউনিয়ন আইয়ুবের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৫৯ সালে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনকে নিয়ে একুশ উদযাপনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ১৯৬০ ও ১৯৬১ সালে এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকে। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী পালন করার মাধ্যমে ছাত্রসমাজ সরকারের সাম্প্রদায়িক ও বাঙালিবিরোধী মনোভাবকে অগ্রাহ্য করে। ১৯৬১ সালে আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টির বৈঠকের পর আন্দোলন বিষয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৩০ ডিসেম্বর এই বৈঠকে সামরিক শাসনের পরিবর্তে গণতন্ত্র ও বিভিন্ন অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং 'আইয়ুবের শিক্ষানীতি' বাতিল চায় তারা। রাজবন্দিদের মুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে আন্দোলন শুরুর প্রস্তাব করে, যা ওই মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত আকারে গৃহীত হয়। আরও সিদ্ধান্ত হয়, ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে স্বৈরতন্ত্রবিরোধী জঙ্গি আন্দোলন। ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি প্রবীণ নেতারা অন্যায়ভাবে হেনস্তা ও গ্রেফতার হলে ৩১ জানুয়ারি ৪টি ছাত্র সংগঠন মধুর ক্যান্টিনে যৌথ বৈঠকে বসে। ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন ছাড়া বাকি দুটি সংগঠন (ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন ও ছাত্র শক্তি) ছিল সরকারের সমর্থক। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল সরকারবিরোধী আন্দোলনকে ভুল পথে পরিচালিত করা। অবশ্য ছাত্রলীগ এ বিষয়ে সতর্ক ছিল।

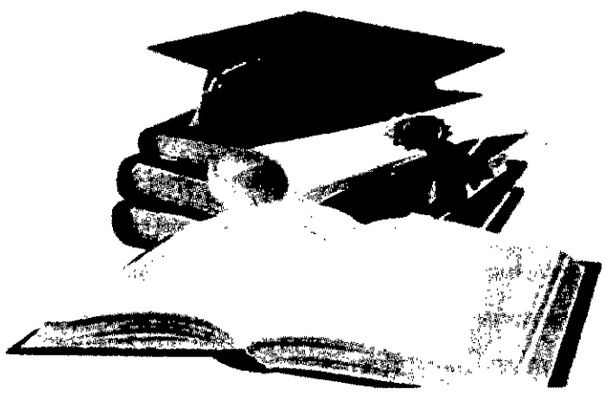

১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ২ ফেব্রুয়ারি রাজপথে জঙ্গি মিছিল সামরিক আইন ভঙ্গ করে। ৪-৫ ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে। ৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজার হাজার ছাত্র প্রতিবাদ সমাবেশে উপস্থিত হয়। ৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নের সুসজ্জিত একটি মিছিল নাজিমুদ্দিন রোড দিয়ে পুরান ঢাকায় প্রবেশ করে। এ মিছিল প্রতিহত করতে সরকার পুলিশের সঙ্গে সেনাবাহিনী নিয়োগ করে এবং কার্জন হলের মোড়ে ফিল্ড কামান বসানো হয়। আন্দোলনকারীরা ওই দিন আইয়ুব খানের ছবি পুড়িয়ে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে। ৮ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হওয়ার পরও ছাত্ররা হল ত্যাগ করছে না দেখে পুলিশ ও সেনাবাহিনী বিশ্ববিদ্যালয় ঘেরাও করে ছাত্রদের জোর করে বের করে দেয়। প্রচণ্ড বৃষ্টি সত্ত্বেও পুলিশ বেষ্টনীর মাঝে আটকা পড়েছিল আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা। তাদের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা আগেই জারি হয়েছিল, যা বহুদিন পর্যন্ত বহাল ছিল। এভাবে সারাদেশে আইয়ুববিরোধী, শিক্ষানীতিবিরোধী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। মার্চে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর কেন্দ্রীয়ভাবে আন্দোলন চাঙ্গা হতে থাকে। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্ব যথাযথ ভূমিকা পালন না করায় কয়েক মাস ছাত্র আন্দোলন কিছুটা মন্থর থাকে। অবশেষে ১৯৬২ সালের ২৫ জুন দেশের ৯ জন বিশিষ্ট নাগরিক এক বিবৃতিতে আইয়ুব ঘোষিত শাসন ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করে নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবি জানান। নেতৃবৃন্দ সারাদেশে জনসভা করার ফলে জনমনে কিছুটা আশার সঞ্চার হয়। '৬২-র দ্বিতীয়ার্ধে সরকার ঘোষিত শিক্ষানীতির প্রতিবাদে আন্দোলন আবার বেগবান হয়ে ওঠে।

প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ঢাকা কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল স্কুল, ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউটসহ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্ব-স্ব দাবির ভিত্তিতে জুলাই-আগস্ট মাসজুড়ে আন্দোলন চলতে থাকে। এ আন্দোলন কর্মসূচিকে সংগঠিত রূপ দিতে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন পাকিস্তান স্টুডেন্ট ফোরাম নামে সাধারণ ছাত্রদের একটি মোর্চা গঠন করে। স্টুডেন্ট ফোরাম আইয়ুবের শিক্ষানীতি বাতিল দাবিতে আগস্ট মাসজুড়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ চালাতে থাকে। প্রস্তুতির সময় ছাত্রনেতারা দেশব্যাপী এ কথা বোঝাতে সক্ষম হন– শিক্ষার অধিকার ও গণতন্ত্রের আন্দোলন একই সূত্রে গাঁথা। প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর ১০ আগস্ট ঢাকা কলেজের ক্যান্টিনে বিভিন্ন কলেজ প্রতিনিধিদের নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভা থেকে ১৫ আগস্ট দেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট ও ১০ সেপ্টেম্বর সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। পরে আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য ১০ সেপ্টেম্বর সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচি বাতিল করে ১৭ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী হরতাল কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়। সে হরতাল সর্বাত্মক পালিত হয়। ছাত্রদের সঙ্গে সাধারণ মানুষও পিকেটিংয়ে অংশগ্রহণ করে। সকাল ১০টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজার হাজার মানুষ সমাবেশে উপস্থিত হয়। সমাবেশ শেষে মিছিল বের হয়। জগন্নাথ কলেজে গুলি হয়েছে– এ গুজব শুনে মিছিল দ্রুত নবাবপুরের দিকে ধাবিত হয়। হাইকোর্টে পুলিশের সঙ্গে সংঘাতে না গিয়ে মিছিল আবদুল গনি রোড ধরে যেতে থাকে। পুলিশ তখন পেছন থেকে মিছিলে হামলা করে। লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস ও গুলি চালায়। পুলিশের সঙ্গে দ্বিতীয় দফা সংঘর্ষ বাধে ঢাকা কোর্টের সামনে। এখানেও পুলিশ ও ইপিআর গুলি চালায়। এতে প্রচুর আহত হয়; শত শত ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। বাবুল, গোলাম মোস্তফা ও ওয়াজিউল্লাহ শহীদ হন। ওই দিন শুধু ঢাকা নয়, সারাদেশে মিছিলের ওপর পুলিশ হামলা চালায়। টঙ্গিতে ছাত্র-শ্রমিক মিছিলে পুলিশ গুলি চালিয়ে হত্যা করে সুন্দর আলী নামে এক শ্রমিককে। শেষ পর্যন্ত বুলেট, বেয়নেট আর রক্তচক্ষু কিছুই স্তব্ধ করতে পারেনি দামাল সন্তানদের দাবিকে। ইতিহাসের শিক্ষা এই– প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি কখনও প্রগতির শক্তিকে পরাজিত করতে পারে না। দানবের পরাজয় ও মানবের বিজয় ইতিহাস-নির্ধারিত। এর পর '৬৬-র ৬ দফা, '৬৯-র গণআন্দোলন, এর পর '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ– সব একই সূত্রে গাঁথা।

পরবর্তীকালে ১৯৯১-এ স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন এবং এর পর গ্রেনেড, বোমা ও জঙ্গিবিরোধী লড়াইয়ে '৬২-র চেতনা উজ্জীবিত করেছে দেশবাসীকে। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের ভেতর দিয়ে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঘুরে দাঁড়ায় দেশ। রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রের মতো শিক্ষাক্ষেত্রও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারায় সুসংগঠিত হয়ে উঠতে থাকে। ২০১০ সালে প্রণীত হয় গণমুখী শিক্ষানীতি এবং সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় এই নীতি বাস্তবায়নের কাজ। প্রথমবারের মতো শিক্ষা আইনও আলোর মুখ দেখার পথে।

শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুণগত মান বিচারে এখনও বিশ্বমানে পৌঁছাতে লড়াই করছি আমরা। উন্নত ও মানুষের মতো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার মতো শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চলছে, চলবে এবং এটা চলমান প্রক্রিয়া। উন্নত আধুনিক ও গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শেখ হাসিনার সরকার ছিল; এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। মহান শিক্ষা দিবসের মাস সেপ্টেম্বরে আমাদের শপথ– শহীদদের স্বপ্নসাধ আমরা বৃথা যেতে দেব না।

শিক্ষা আন্দোলন
পরিসংখ্যান বিভাগ
ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
...সনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর